ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬: রক্তক্ষয়ের রেকর্ড

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৬ মে, ২০১৬)

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ২২ মার্চ থেকে শুরু হয়ে এখনও চলমান রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬। ইতোমধ্যেই চারটি ধাপের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২৮ মে ও ৪ জুন ২০১৬ তারিখে যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ধাপের ভোটপর্বের মধ্য দিয়ে এই নির্বাচনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। ব্যাপক সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী অনিয়ম ও নেতিবাচক অনুষঙ্গের দৃশ্যমানতার কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে এটিকেই সবচেয়ে মন্দ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বলে মনে করেন অনেকে। কেননা ব্যাপক রক্তক্ষয় ও অনিয়মের দিক থেকে অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে এই নির্বাচন। নির্বাচনী সহিংসতায় হতাহতের বিষয়টি এতই ব্যাপক যে, ইতোমধ্যেই তা সকল সচেতন মানুষের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সহিংসতায় প্রাণহানি: বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আটবার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন চলছে নবম বারের নির্বাচন। আমাদের দেশে নির্বাচন সম্পর্কে জনমনে এমন একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, নির্বাচন একদিকে যেমন উৎসবের আবহ তৈরি করে, পাশাপাশি কখনও কখনও তা প্রার্থী, দল ও সমর্থকদের অসহিষ্ণুতার কারণে সহিংসতার উপলক্ষ হিসেবেও অবির্ভূত হয়। আর এই সহিংসতা অনেক মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতীতের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলোর প্রাণহানির তথ্য অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৩ ও ১৯৯২-এ প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি। ১৯৮৮ সালে ৮০ জন, ১৯৯৭ সালে ৩১ জন, ২০০৩ সালে ২৩ জন এবং ২০১১ সালে ১০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে বলে জানা যায় (দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল ২০১৬)। অতীতের নির্বাচনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটে ১৯৮৮ সালে। সবচেয়ে খারাপ নির্বাচনের তকমাও জুটেছিল ঐ নির্বাচনের নামের পাশে।

প্রাণহানির ক্ষেত্রে অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এবং তা চলছে দীর্ঘমেয়াদিভাবে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, এবার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে এ পর্যন্ত নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী সংঘর্ষ এবং নির্বাচনকেন্দ্রিক বিরোধের জেরে ১০১ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। আহতের সংখ্যা অন্তত আট হাজার ছাড়িয়েছে। প্রাণহানির তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রথম ধাপের নির্বাচনের পূর্বে ১০ জন, প্রথম ধাপের নির্বাচনের দিন ১১ জন, প্রথম ধাপের নির্বাচনের পর থেকে দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ১১ জন, দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের দিন ৯ জন, দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের পর থেকে তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ১৭ জন, তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের দিন ৫ জন, তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের পর চতুর্থ ধাপের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ১০ জন, চতুর্থ ধাপের নির্বাচনের দিন ৮ জন এবং চতুর্থ ধাপের নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত ২০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। প্রাণহানির হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিভাগভিত্তিক প্রাণহানির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগে ২২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯ জন, বরিশাল বিভাগে ১৬ জন, রাজশাহী বিভাগে ১৬ জন, খুলনা বিভাগে ১৩ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৯ জন, রংপুর বিভাগে ৫ জন এবং সিলেট বিভাগে ১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

দলগত পরিচয়ের দিক থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী বা সমর্থক ৪০ জন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মী বা সমর্থক ১২ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২ জন, জাতীয় পার্টি-জেপি'র ১ জন, জনসংহতি সমিতির ১ জন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী বা সমর্থক ২ জন, মেম্বার প্রার্থীর কর্মী বা সমর্থক ৩১ জন এবং ১২ জন সাধারণ মানুষ রয়েছেন প্রাণহানির তালিকায়। মৃতদের মধ্যে ৪ জন নারী ও ৩ জন শিশুসহ একজন সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী ও ৩ জন মেম্বার প্রার্থীও রয়েছেন।

চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মধ্যে ৪২টি সংঘর্ষের ঘটনায় ৪৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ৩টি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে, একটি আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির মধ্যে, একটি আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি-জেপি'র মধ্যে এবং ৩৩টি আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী বা সমর্থকদের মধ্যে ঘটেছে। অবশিষ্ট ৫টি সংঘর্ষ আওয়ামী লীগের সাথে কার ঘটেছে তা স্পষ্ট নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী মেম্বার প্রার্থীদের মধ্যে ২৭টি সংঘর্ষের ঘটনায় ২৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ১৯ জন।

এ পর্যন্ত নিহত ১০১ জনের মধ্যে নির্বাচন-পূর্ব সংঘর্ষে ৪৫ জন, নির্বাচনকালীন সংঘর্ষে ৩৬ জন এবং নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আমরা মনে করি যে, প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে গ্রহণ না করে, যে কোনো মূল্যেই জয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই নির্বাচনী সহিংসতার বড় কারণ। আর নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করেও পার পাওয়া গেলে সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিরাজমান বাস্তবতায় রাজনৈতিক দলভিত্তিক নির্বাচনে এই প্রবণতাগুলো বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক, যা ঘটছে এই নির্বাচনে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, নিহত সর্বমোট ১০১ জনের মধ্যে চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা বিরোধেই প্রাণ গিয়েছে ৬৩ জনের। পাশাপাশি এই নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গের বিরুদ্ধে কখনই নির্বাচন কমিশনকে আমরা কঠোর অবস্থানে দেখিনি। এটাও সহিংসতায় বৃদ্ধির বড় কারণ।

শুধুমাত্র নির্বাচনী সহিংসতায়ই নয় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও নেতিবাচক অনুষঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই এই নির্বাচন অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। চলমান নির্বাচনের দৃশ্যমান ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে আরও কিছু বিষয় স্পষ্ট হতে পারে। বিষয়গুলো সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

মনোনয়ন বাণিজ্য: আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্যের কথা শোনা যেত। স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে। নির্দলীয় নির্বাচন হওয়ায় ইতোপূর্বে দল থেকে মনোনয়ন দেওয়ার কোন বিষয় ছিল না। প্রার্থীদের বড়জোর দল কর্তৃক সমর্থন দেওয়া হতো। দলভিত্তিক স্থানীয়

সরকার নির্বাচন ব্যবস্থার ফলে নির্বাচনী আইনানুযায়ী এখন চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। আর এই মনোনয়ন দিতে গিয়েই ঘটছে বাণিজ্যের ঘটনা। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনয়ন বাণিজ্যের প্রবণতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যে, প্রতিদিনই তা গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে। মনোনয়ন বাণিজ্যের ঘটনা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলে ঘটার অভিযোগ পাওয়া গেলেও, আওয়ামী লীগে এর ব্যাপকতা বেশি। এক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের বিরুদ্ধে বেশি করে উঠেছে এ অভিযোগ। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও অভিযোগের বাইরে না। শোনা যায়, মনোনয়ন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের প্রথমে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মন যুগিয়ে সমর্থক পাল্লা ভারি করতে হয়। এরপর সন্তুষ্ট করতে হয় সংশ্লিষ্ট জেলা-উপজেলা নেতৃবৃন্দকে। মাননীয় সংসদ সদস্য যদি স্থানীয় নেতৃত্বের পদে না থাকেন, তবে তার সন্তুষ্টিবিধান মনোনয়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড। এ পর্যায়ে কেন্দ্রে প্রেরিত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের তার নাম যাতে পাল্টে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। তবে কাঠখড় পোড়াতে হয় তাদের, যারা অন্য প্রার্থীর নাম কেটে নিজের মনোনয়ন নিশ্চিত করতে চান। মনোনয়ন বাণিজ্যের বিষয়টি এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, চট্টগ্রাম, সিলেট, সিরাজগঞ্জ, খুলনা ও কুমিল্লাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সংবাদ সম্মেলন বা মানববন্ধন করে মনোনয়ন বাণিজ্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াতপন্থীদের এমনকি জেএমবি সদস্যকে মনোনয়ন দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। কোনো কোনো এলাকায় নিজ প্যানেলভুক্ত করার কথা বলে মেম্বার প্রার্থীদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহের অভিযোগ উঠেছে চেয়ারম্যান প্রার্থীর বিরুদ্ধে। ২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেও স্থানীয় সংসদ সদস্যের বিরোধিতার কারণে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাননি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক আওয়ামী লীগ নেতা। পরে তিনি ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মাননীয় সংসদ সদস্যের আশির্বাদপ্রাপ্ত হন এবং তার ইউনিয়নে সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস আদায় করেন। উল্লেখ্য, যে, ২২ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি জয়ীও হয়েছেন।

আমরা মনে করি, মনোনয়ন বাণিজ্যের মনোভাব পরিহার করে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো যদি সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের মনোনয়ন প্রদান করতো, তবে একদিকে তা যেমন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের পথ সুগম হতো, অপরদিকে তা দলে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে ভালো মানুষের নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতো। জনসেবার ক্ষেত্রে এর সুফল হতো সুদুরপ্রসারী।

চেয়ারম্যান পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া: নির্বাচনী আইনানুযায়ী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া দোষের না। অতীতে বিষয়টিকে দেখেছি আমরা ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে। চলমান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনসহ সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত কয়েকটি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার যে সংখ্যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তাতে বিষয়টিকে আর ব্যতিক্রমী বলা যাচ্ছে না। চেয়ারম্যান পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার অতীতের যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সে অনুযায়ী ১৯৮৮ সালে ১০০ জন, ১৯৯২ সালে ৪ জন, ১৯৯৭ সালে ৩৭ জন এবং ২০০৩ সালে ৩৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রেও ১০০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের নিয়ে ১৯৮৮ সাল ছিল এগিয়ে।

তবে অতীতের সকল রেকর্ড ম্লান হয়ে গিয়েছে এবারের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের সংখ্যার কাছে। নবম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এই সংখ্যা ২২০। প্রথম ধাপে ৫৪ জন, দ্বিতীয় ধাপে ৩৪ জন, তৃতীয় ধাপে ২৯ জন, চতুর্থ ধাপে ৩৪ জন, পঞ্চম ধাপে ৪২ জন এবং ষষ্ঠ ধাপে এ পর্যন্ত ২৭ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এরা সকলেই ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী।

ব্যাপকহারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, অনেক স্থানে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, মনোনয়নপত্র জমাদানে বাধা প্রদান, মনোনয়নপত্র কেড়ে নেওয়া বা ছিঁড়ে ফেলার কারণে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি। ১৪ দলের শরিকদের মধ্য থেকেও এমন অভিযোগ উঠেছে। কেউ কেউ মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও চাপ সৃষ্টির কারণে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন। ছোট-খাটো বা সংশোধনযোগ্য ত্রুটির কারণে যাচাই-বাছাইকালে বাতিল হয়ে গেছে অনেকের মনোনয়নপত্র।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হলো অনেক ইউনিয়নে বিএনপি কর্তৃক প্রার্থী না দিতে পারা। অনেক অঞ্চলে মামলা ও গ্রেপ্তারের ভয়ে সম্ভাব্য প্রার্থীরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোনো কোনো এলাকায় নিজের ও পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় অনেকে দলের কাছে মনোনয়নই চাননি। কোথাও কোথাও বিএনপি নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। ফলে দেখা গিয়েছে যে, এই নির্বাচনে নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বিএনপির প্রার্থীশূন্য ছিল বা আছে মোট ৫৫৪টি ইউনিয়ন। প্রথম ধাপে ১১৯, দ্বিতীয় ধাপে ৭৯, তৃতীয় ধাপে ৮১, চতুর্থ ধাপে ১০৬টি, পঞ্চম ধাপে ১০০টি এবং ষষ্ঠ ধাপে এখন পর্যন্ত ৬৯টি ইউনিয়নে বিএনপি'র প্রার্থীশূন্য ছিল। বিএনপির মত একটি বড় রাজনৈতিক দলের ৫৫৪টি ইউনিয়নে প্রার্থী না থাকা একটি বড় ঘটনা বটে!

আমরা মনে করি, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার হার যেভাবে বাড়ছে তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। সম্পদশালী ও পেশিশক্তির অধিকারী প্রভাবশালী প্রার্থী বা দলের কাছে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য এটা একটি জনপ্রিয় কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এতে করে নির্বাচনী ব্যবস্থা আরও অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে – যা জাতির জন্য হবে আত্মঘাতী।

অন্যান্য নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ: উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হওয়া চারটি ধাপের নির্বাচনে একই ধরনের চালচিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রতিটি ধাপের নির্বাচনের পূর্বেই প্রতিপক্ষের এজেন্টদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে না দেওয়া বা ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া; বুথ দখল করে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরা; চেয়ারম্যান প্রার্থীর ব্যালটে প্রকাশ্যে ভোট দিতে বাধ্য করা; নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যালট পেপারে সিল মারা বা সিল মারতে সহায়তা করা; ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। কোনো কোনো এলাকায় ভোট প্রদানে

এমন অস্বাভাবিকতা ছিল যে, ভোট প্রদানের তালিকায় মৃত ব্যক্তি ও প্রবাসীরাও ছিলেন। কোথাও কোথাও ভোট পড়ার হার ছিল ১০০ শতাংশেরও অধিক। কোনো কোনো ইউনিয়নে নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষ করে বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় নির্বাচন পরবর্তীকালে অনেক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার শিকার হয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। বাগেরহাটের চিতলমারী ও ফকিরহাট এবং বরিশালের বানারীপাড়া, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া ও উজিরপুরের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার পাশাপাশি বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি ঘটনা ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অথবা আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের কর্মী-সমর্থকদের মাধ্যমে ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কোনো কোনো এলাকায় নির্বাচনের পূর্বে সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও পাওয়া গিয়েছে।

এই নির্বাচনের আর একটি নেতিবাচক দিক হচ্ছে নির্বাচন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্টরা বিশেষ করে নির্বাচন কমিশন, সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বিকার মনোভাব। একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন সাহসিকতা ও নিরপেক্ষতার সাথে আইনি দায়িত্ব কঠোরতার সাথে যথাযথভাবে পালন করছে না। সরকারের পক্ষ থেকেও এই নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে না। ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সব এলাকায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে নির্বাচনী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে না। রাজনৈতিক দল বিশেষ করে ক্ষমতাসীনরাও দায়িত্বশীল আচরণ করছে না। তবে চতুর্থ ধাপের নির্বাচনের পূর্বে সরকার প্রধান এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের প্রতি কঠোরতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানানো হলেও, নির্বাচন কমিশনের আদেশ উপেক্ষা করতেও দেখা গিয়েছে সরকারকে। জনৈক পুলিশ কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে প্রত্যাহার এবং পরে কমিশনের অনুমোদন ছাড়া পুনর্বহালই এর বড় উদাহরণ।

আমরা মনে করি যে, নির্বাচন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্টরা বিশেষ করে নির্বাচন কমিশন, সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক যথাযথ ভূমিকা পালন এবং নির্বাচনী আইন যথাযথভাবে অনুসরণ ছাড়া কখনই অবাধ, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা সম্ভব নয়।

ফলাফল: ব্যাপক অনিয়মের কারণে চলমান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন একদিকে যেমন ত্রুটিমুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হয়নি, পাশাপাশি এর মধ্য দিয়ে ফলাফলও এসেছে একপেশে। ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ পর্যন্ত ঘোষিত ২,৬০৭টি ইউনিয়নের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১,৭৯৯টি (৬৯%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ২৩৮টি (৯.১২%), জাতীয় পার্টি-জাপা ৩২টি (১.২২%), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ ৬টি (০.২৩%), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ৩টি (০.১১%), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২টি (০.০৭%), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ১টি (০.০৩%), জাকের পার্টি ১টি (০.০৩%) এবং স্বতন্ত্র ৫২১টি (১৯.৯৮%) ইউনিয়নে জয়ী হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে আসা ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হলো।

রাজনৈতিক দল	ধাপভিত্তিক নির্বাচনী ফলাফল								সর্বমোট			মন্তব্য
	প্রথম ধাপ		দ্বিতীয় ধাপ		তৃতীয় ধাপ		চতুর্থ ধাপ					
	মোট ইউপি	বিজয়ীর সংখ্যা	মোট ইউপি	বিজয়ীর সংখ্যা	মোট ইউপি	বিজয়ীর সংখ্যা	মোট ইউপি	বিজয়ীর সংখ্যা	মোট ইউপি	বিজয়ীর সংখ্যা	শতকরা হার (%)	
আওয়ামী লীগ	৬৮৫	৫১৮	৬২৯	৪৪৭	৬১০	৩৯৫	৬৮৩	৪৩৯	২৬০৭	১৭৯৯	৬৯	
বিএনপি		৪৭		৬১		৬০		৭০		২৩৮	৯.১২	
জাতীয় পার্টি-জাপা		৪		৪		১৪		১০		৩২	১.২২	
জাতীয় পার্টি-জেপি		৪		-		-		-		৪	০.১৫	
জাসদ		৩		২		১		-		৬	০.২৩	
ওয়ার্কার্স পার্টি		২		-		-		১		৩	০.১১	
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ		১		-		-		১		২	০.৭	
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম		-		-		১		-		১	০.৩	
জাকের পার্টি		-		-		-		১		১	০.৩	
স্বতন্ত্র		১০৬		১১৫		১৩৯		১৬১		৫২১	১৯.৯৮	
সর্বমোট	৬৮৫	৬৮৫	৬২৯	৬২৯	৬১০	৬১০	৬৮৩	৬৮৩	২৬০৭	২৬০৭	১০০	

ফলাফল বিশ্লেষণ করে এ পর্যন্ত চার ধাপে ১৭ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রথম ধাপে ৮ জন, দ্বিতীয় ধাপে ৪ জন, তৃতীয় ধাপে ২জন এবং চতুর্থ ধাপে ৩ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। প্রথম ধাপে নির্বাচিত ৮ জনই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে

জনের মধ্যে ৫ জনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত। দ্বিতীয় ধাপের ৪ জনের মধ্যে ৩ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে এবং ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তৃতীয় ধাপে বিজয়ী ২ জনের মধ্যে একজন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে এবং একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। চতুর্থ ধাপের ৩ জনের সকলেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। বিজয়ী নারী প্রার্থীদের তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক্রমিক	নাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা	বিভাগ	রাজনৈতিক দল	মন্তব্য
প্রথম ধাপ:							
১	মর্জিনা বেগম	সোনাইলতলা	মংলা	বাগেরহাট	খুলনা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত
২	বিউটি আক্তার	সন্তোষপুর	চিতলমারী				
৩	শিরিন আখতার	ফকিরহাট	ফকিরহাট				
৪	মোরশেদা আক্তার	তেলিগাতী	মোড়েলগঞ্জ				
৫	তাছলিমা বেগম	রাঢ়ীপাড়া	কচুয়া				প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত
৬	জেসমিন আক্তার	সিদ্ধকাঠি	নলছিটি সদর	ঝালকাঠি	বরিশাল		বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত
৭	প্রগতি মণ্ডল	দৈহারী	নেছারাবাদ	পিরোজপুর			প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত
৮	সানজিদা আক্তার	মালখানগর	সিরাজদিখান	মুন্সিগঞ্জ	ঢাকা		
দ্বিতীয় ধাপ:							
১	নাছরিন সুলতানা	নওয়াপাড়া	যশোর সদর	যশোর	খুলনা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
২	নাজনীন নাহার	রামনগর					
৩	রওশন আরা বেগম	বাহিরচর	ভেড়ামারা	কুষ্টিয়া			
৪	মৌসুমী আক্তার	নবীনগর (পূর্ব)	নবীনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	চট্টগ্রাম	স্বতন্ত্র	
তৃতীয় ধাপ:							
১	মোছাঃ ছনিয়া সবুর	রাজাপুর	বেলকুচি	সিরাজগঞ্জ	রাজশাহী	আওয়ামী লীগ	
২	নার্গিস আক্তার বুবলি	কুলাউড়া	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার		স্বতন্ত্র	
চতুর্থ ধাপ:							
১	সম্পা মাহমুদ	হাটশহরীপুর	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া	খুলনা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
২	সানজিদা সুলতানা	মরজাল	রায়পুরা	নরসিংদী	ঢাকা		
৩	তাহেরা খাতুন	রংছাতি	কলমাকান্দা	নেত্রকোণা	ময়মনসিংহ		

আমরা মনে করি যে, নগণ্য সংখ্যক নারীর নির্বাচিত হওয়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বর্ণিত ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। আর রাজনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে **প্রথমত,** রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা ও তৃণমূলের নেতাকর্মীদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নসহ রাজনীতিতে সুস্থতা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি। **দ্বিতীয়ত,** নির্বাচন কমিশনকে প্রকৃত অর্থেই স্বাধীন ও শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। কেননা অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য যথাযথ নির্বাচনী আইন ও এর প্রয়োগ যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি সৎ, দক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদান। সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে আইন প্রণয়ন এবং সেই আইন মোতাবেক পদ্ধতিগতভাবে কমিশনারদের নিয়োগ এখন সময়ের দাবি। উল্লেখ্য, আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রণীত আমাদের সংবিধানে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য আইন প্রণয়ন করার কথা থাকলেও, সংবিধান প্রণয়নের ৪৪ বছর হয়ে গেলেও আমরা অদ্যাবধি সেই আইন প্রণয়ন করতে পারিনি। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতিগতভাবে আমাদের এই বিষয়টিতে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন, যাতে নতুন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষেই পরবর্তী নির্বাচন কমিশনের কমিশনারদের আমরা নিয়োগ দিতে পারি। **তৃতীয়ত,** রাজনৈতিক সংস্কারের আর একটি বড় বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, জনপ্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয়করণের প্রভাবমুক্ত করা, যাতে তারা নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

আশা করি, রাজনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা উপরোল্লেখিত পদক্ষেপসমূহ যথাযথভাবে গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে সুস্থতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি জাতিগতভাবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবো, যা রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকেও সুগম করবে।